অবচয় ও অপচয়

যুগান্তরের উপসম্পাদকীয় কলামে (৩১/১২/২৩) 'বাজেট সংকোচনের সময়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন' শিরোনামে নিবন্ধটি পড়লাম। দেখলাম, এবারের নির্বাচনে খরচের জন্য দুই হাজার দুই'শ কোটি টাকার বেশি চাইছে নির্বাচন কমিশন। নাচতে গিয়ে তো আর ঘোমটা দেওয়া চলে না, নাচার মতোই নাচতে হয়। কথায় আছে 'শয়তানকেও তার পাওনাটা দাও'। খরচের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনেরই-বা কী করার আছে! খরচ করে বিভিন্ন ধরণের কাজের ব্যয় তো নির্বাহ করতেই হবে। এ খরচকে তো আমি টাকার 'অপচয়' বলতে পারি না। তবে একই খরচ বারবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই করতে হলে তাকে 'অপচয়' তো বলতেই হবে। দেশের 'গণতন্ত্র' রক্ষায় অন্তত এ খরচটুকু তো করতেই হবে। দেশের 'গণতন্ত্রের (?) লাইসেন্স নবায়নে' এটা তেমন বেশি কিছু নয়। তার চেয়ে শত গুণ বেশি অবৈধ টাকা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, ব্যাংক লুট হচ্ছে, কিংবা 'রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা' দেশীয় অর্থ বিনা-আয়করে আত্মসাৎ করছে। জনসাধারণ নিয়ে ভাবনার তেমন কিছু নেই। এদের সহ্যসীমা অনেক বেশি। ডলারের দাম বেড়েছে, দ্রব্যমূল্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে– এতে আমি যতটা না উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে পুলকিত যে, বর্ধিত অসংখ্য পণ্যমূল্যের উপর অব্যাহত নির্দিষ্ট হারে ভ্যাট কর্তনের ফলে সরকারের আয়ও বেড়েছে। সে অর্থে কিংবা অধিক হারে সুদে টাকা ধার-দেনা করে আনা অর্থে নির্বাচনব্যয় মেটানো যাবে। খরচে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে।

'অবচয়' ও 'অপচয়' শব্দযুগল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিষয়টা চলে এসেছে। এগুলো সম্পর্কযুক্তও বটে। শব্দযুগলকে আমি ছাত্রজীবনে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলতাম। এখন মোটামুটি বশে এসেছে। এখানে আমি একাউন্টিংয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছি না। পাঠকমহলকে এদেশের বাস্তবতার আলোকে বিষয় দুটোকে তুলে ধরছি। অবচয় (Depreciation) কোনো স্থায়ী সম্পদের মোট আয়ুষ্কালের খরচকে প্রতি ছোট ছোট সময়ের মধ্যে (যেমন প্রতি বছর) ব্যবহারজনিত ক্ষয়ের ফলে একটা নির্দিষ্ট ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া। অসুবিধা অন্য কোথাও। এ অপবাদ (না-কী মতবাদ?) আমাদের চিরন্তন যে, 'সরকারকা মাল, দরিয়ামে ঢাল'। আমিও একমত পোষণ করি। সরকারি মাল দরিয়ায় ঢালবো না তো নিজের মাল দরিয়ায় ঢালবো নাকি! বাঙালিদের মধ্যে এত পাগল কেউ আর আছে বলে মনে হয় না। ধরুন, সরকারি বাস কোম্পানির কথা। অনেক কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশ থেকে 'ভলভো' নামের দোতলা দামি বাস অনেকগুলো কিনে আনা হলো। কার্যকরী আয়ুষ্কাল ধরা হলো প্রতিটির ১২ বছর করে। কোম্পানির কর্মচারীরা বাসের সামনের গ্লাস ছাড়া পাশের বা পেছনের গ্লাসগুলো তেমন একটা মোছে না। সরকারি হাতের স্নেহ-মমতা সরকারি সম্পদকে স্পর্শ করে না। অযত্নে-অবহেলায় এমনই অবস্থা হয় যে, এক বছর যেতে-না-যেতেই গ্লাসগুলো স্পটেড হয়ে যৌবন হারিয়ে বুড়ো হয়ে যায়। অতি তাড়াতাড়ি লক্কড়মার্কা হয়ে যায়। গাড়ীর ভেতরের অবস্থাটাও এ অবহেলা থেকে রক্ষা পায় না। কখনো যন্ত্রাংশ হারাতে থাকে। ১২ বছরের আয়ুষ্কাল যদি পাঁচ বছরে নেমে আসে, প্রতিবছরের অবচয় বাবদ খরচ কত বাড়বে? আবার এক টাকার জিনিস যদি তিন টাকায় কিনি। অবচয় বাড়বে, না কমবে? দু-জায়গায় ফাঁকি। সুবিধা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি কিনতে পারি ততই অতিরিক্ত মূল্যের লাভটা পকেটে আসে। প্রতিটা সরকারি হাসপাতালের কোটি কোটি টাকা দামের যন্ত্রপাতি কতগুণ বেশি দামে কেনা হয়? যন্ত্রপাতির ভেতরের পার্টস (যন্ত্রাংশ) কেমন মানের দেওয়া হয়? প্রতিনিয়ত পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, জেনে নিন। ছয় মাস না যেতেই নষ্ট ও বিকল হয়ে পড়ে থাকে। হাসপাতালে যন্ত্রপাতি ঠিকই থাকে, কিন্তু অব্যবহার্য। (রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটা বালিশ নিচ থেকে ওপরতলায় উঠাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছিল?)। কারণ ও অবচয়ের পরিমাণ জানার জন্য চোখ-কান খোলা একজন বাঙালিই যথেষ্ঠ, বিদেশ থেকে গবেষক ভাড়া করে আনার দরকার আছে কি? সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বিষয়গুলো আমলে নেয় কি না? হ্যাঁ, নেয়। মুখরক্ষার জন্য সাময়িকভাবে নেয়। বিষয়গুলোর 'লোম বাছতে গেলে কম্বল উজাড় হবে' সে-ভয়ে চুপ করে যায়।

সরকারি প্রতিটা দপ্তরে, প্রতিটা সেক্টরের একই দশা, কিছু কম-বেশি। 'খেলা চলছে হরদম! হরদম! হরদম! এ কী খেলা চলছে হরদম? এক দিকে নিরন্ন মানুষ, আরেক দিকে (দুর্নীতি নামের) এটম'। যে দেশের মানুষের সব কিছু সয়, নির্বাচনব্যয়ই-বা সইবে না কেন? গণতন্ত্র আসুক বা না আসুক, নির্বাচনের নামে টাকার অবস্থানের পরিবর্তনের হার (বেগ) (Velocity of money) তো অন্তত বাড়ছে। অনেককেই নির্বাচন নিয়ে ভাবতে দেখি। আমি কিন্তু একটুও ভাবি না। আমার ভাবনা দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে। এদেশ কীভাবে চলছে ও চলবে– তা নিয়ে। আমি ভাবি, আমার তো বিদায় নেবার পালা চলে এসেছে, আমার স্নেহধন্য ছেলেমেয়ে ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভবিষ্যত কী দশা অপেক্ষা করছে, তা নিয়ে।

এবারের নির্বাচনে হরতাল-অবরোধ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা বেশি হওয়াতে ঢাকার বাইরে যেতে পারিনি। ঢাকার রাজপথে বেশি ঘোরাফেরা করছি। একটা বিষয় জঘণ্য মানসিকতার পরিচায়ক বলে মনে হয়েছে। যে এলাকা থেকে যে বা যারা নির্বাচন করছেন, সেখানকার রাস্তার দুপাশ বরাবর ওপর-নিচের সারি, কখনো আইল্যান্ডের উপর-নিচের সারি ধরে মাইলের পর মাইল একই দড়িতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পর পর পোস্টারের মালা গেঁথে টাঙানো হয়েছে। পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পর পর পোস্টার টাঙানোর যৌক্তিকতা কী? এদেশের লোক কি এতটাই কানা যে, দূরে দূরে পোস্টারিং করলে তারা চোখে দেখতে পেতেন না! এটা বিকৃত রুচির পরিচায়ক নয় কি? এতে দেশের কত কোটি টাকার কাগজ ও প্রিন্টিং খরচ বাহুল্য দিতে হয়েছে? অথচ এদেশের লক্ষ লক্ষ শিশু টাকা ও কাগজের অভাবে পড়াশোনা করতে পারছে না। দেশের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্রপীড়িত। এভাবে টাকাগুলো অযথা অপব্যয় করে, টাকার গরম না দেখিয়ে জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে টাকাগুলো ব্যয় করলে সাধারণ মানুষ অনেকভাবে উপকৃত হতে পারতো। তারা জনসাধারণের সেবার নাম নিয়েই তো পদপ্রার্থী হয়েছেন! পদপ্রার্থীদের জনসেবার মানসিকতা কোথায়? এ আবার কেমন জনসেবার মানসিকতা? কারো কামেল-ফকির হওয়ার দরকার নেই, এরা নির্বাচনে পাশ করে ভবিষ্যতে জনসাধারণের কেমন সেবা করবে– তা কি কেউ পূর্বানুমান করতে পারে না? এরা নির্বাচনে পাশ করে জনকোষাগার থেকে কতগুণ টাকা ফেরত নেওয়ার কৌশলে মেতে উঠবে? কত দেশের নির্বাচনই তো জীবনে দেখেছি, কিন্তু এত অপচয়ের (Misuse) মানসিকতা তো কোথাও দেখিনি।

আরেকটা কথা বলি বলি করে বেশ কিছুদিন থেকে বলা হচ্ছে না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনলে এদেশের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ হয়তো আমার ওপর নাখোশ হতে পারেন, কিন্তু না বলে পারছি না। তাই এ অবাঞ্চিত কথার অবতারণা। এ পর্যন্ত এদেশে প্রায় ৩০০ টি 'মডেল মসজিদ' হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হয়েছে। আরো তৈরি হবে। এর মোজেজা কী? এদেশে কি এমন কেউ আছেন যিনি মসজিদের অভাবে নামাজ আদায় করতে পারেননি? মসজিদের কথা শুনলে নামাজি-বেনামাজি প্রত্যেকেই সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, আমাদের পাঁচটা গ্রাম মিলে একটা মসজিদ। মানুষগুলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারপর প্রতিটা গ্রামে ক্রমশ একটা করে মসজিদ হলো। দলাদলির ফলে মসজিদের সংখ্যা বাড়া শুরু করলো। বর্তমানে প্রতি গ্রামেই চার-পাঁচটা করে মসজিদ। এমনকি পাঁড়ায় পাঁড়ায় মসজিদ। মুসলমানদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে, দলে দলে শত্রুতা, হিংসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। নৈতিকতার উন্নতি ও অহিংস ঈমানি-শিক্ষা ছাড়া এসব দূর হবে না।

সমস্যা আরো অন্য জায়গায়। গ্রাম এলাকার অধিকাংশ মসজিদে জুমআর দিনে একটা কাতারও পুরো হয় না। ওক্তীয় নামাজে উপস্থিতির বেহাল দশা। নামাজি লোকের অভাব। আবার নামাজি লোক যেনতেন, মুসলমানি জীবনবিধান ও চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ লোকের আরো অভাব। এদেশে খাতা-কলমে নব্বই শতাংশ লোক মুসলমান। কুরআন ও হাদিস ঘাঁটলে দেখা যায় মুসলমান নামে নয়, পোশাকেও নয়, মুসলমান তার চিন্তা-চেতনা, বৈশিষ্ট্য ও কাজে। সমাজে এমন লোকের খুব ঘাটতি। এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার লোকও কম। কয়েক বছর আগে একটা

লেখা পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল, 'নবীর যুগে মানুষ গড়েছে গড়েনি তো মসজিদ, আমাদের যুগে মসজিদ গড়েছে মানুষ হয়নি ঠিক।' কথাটা আমার ভাবনার উদ্রেক করেছিল। বর্তমানে যে মসজিদেই যাই, দামি লাইলস চারদিকে লাগানো। অনেক মসজিদে এসির ব্যবস্থাও আছে। আমি মনে মনে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের সবার ঈমানের হালত কী? কোনো উত্তর পাই না। মসজিদের দেওয়ালে শক্ত প্লাস্টারের প্রলেপ না দিয়ে, দামি টাইলস ফিটিং না করে ঈমানের দেওয়ালে শক্ত সিমেন্টের প্লাস্টার ধরালে, এর জন্য টাকা খরচ করলে কতই না ভালো হতো! মুসলমানি চরিত্রে টাইলস ফিটিং করলে এদেশের যত মিথ্যা, শঠতা ও মোনাফেকি অতি অল্প সময়ে দূর হয়ে যেত। প্রশ্ন জাগে, আগে মডেল মসজিদ গড়বো, না কি আগে মানুষ গড়বো? প্রয়োজন ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্ববোধ ও ইমানি শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-জাগানিয়া শিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। এর জন্য টাকা ব্যয় করা। তারা তাদের প্রয়োজনমতো মসজিদ গড়ে নেবে। আমরা টাকা খরচ করে মুসলমান তৈরি করবো। অথচ আমরা যাচ্ছি স্রোতের বিপরীতে। মসজিদ কখনো মুসলমান বানায় না, মুসল্লিও তৈরি করে না, মুসল্লিরা মসজিদ বানায়। আমাদের প্রয়োজন মুসল্লি তৈরি করা। ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তির বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। নামধারী মুসলমানকে ইসলামি আদর্শে শিক্ষা দেওয়া।

এদেশে কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসায় লাখ লাখ গরীব-অসহায় ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনানুযায়ী সীমিত। তারা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও সুবিধা বঞ্চিত। এলাকার বিভিন্ন দাতা ও সহায়তাকারীদের আর্থিক সহায়তায় তাদের চলতে হয়। তাদের জীবনযাপনের অবস্থাও উন্নত নয়। অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে জীবনে টিকে থাকতে হয়। শুধুমাত্র কুরআন ও হাদিস পড়ে এদেশে জীবন গড়া যায় না। বেশি বেতনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয় না। বড় হয়ে রুজি-রোজগার কতটুকু করতে পারে তা আমরা সমাজের প্রতিটা সচেতন মানুষই জানি, যদিও তাদের মধ্যে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জীবন আধা-প্রস্ফুটিত ফুল হয়েই অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রয়োজনেই তাদেরকে উন্নত জনশক্তিতে পরিণত করা বাঞ্চনীয়। যথাযথ সুযোগ পেলে তারাও দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে। তারাও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটা অংশ। কুরআন ও হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি কেউবা টেকনিক্যাল শিক্ষায় যাবে, কেউবা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানব সেবায় মনোনিবেশ করতে পারে। এভাবে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে মডেল মসজিদ তৈরির পরিবর্তে মাদ্রাসার অসহায়-দরিদ্র ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের গড়ে তোলা, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজে ব্যয় করলে অসংখ্য গরিব-মেধাবী ছাত্রছাত্রী জীবনের দিশা পেত এবং সমাজের কল্যাণ সাধিত হতো। এজন্য খরচ করাকে খরচ না ভেবে মানবসম্পদ তৈরিতে বিনিয়োগ বলে ভাবতে পারতাম। সংশ্লিষ্ট পক্ষ বিষয়টা ভেবে দেখতে পারে, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে মডেল মসজিদ গড়া অপচয়, না কি অবচয়, না কি সৌখিনতা। আমরা এদেশের মানুষ কিন্তু ইসলামি জীবনবিধান ও কর্ম ভুলে অতি সহজে, সহজ বুদ্ধিতে বিনা-বাধায় বেহেশতে যেতে সব সময় প্রস্তুত থাকি এবং সে ব্যবস্থায় বেশি মনোযোগী হই।

(৬ জানুয়ারি ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ